বর্ণপরিচয়

মধুময় পাল

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

আলো আর বুলবুলি	৯
মৎস্যগন্ধা	১৯
স্বপ্নের অবিরত মুখ	২৬
দাও হে তোমার অস্ত্র	৩৯
ভাবের ঘরবাড়ি	৪৭
হেরো টিমের ক্যাপ্টেন	৫৩
বর্ণপরিচয়	৫৯
বন্ধু, রহো রহো সাথে	৭৩
সারদাপুলিস ও ব্লু ফিল্ম	৮১
তবুও মানব থেকে যায়	১০১
তরুবালা ও এক পলায়নকারী	১২৭

আলো আর বুলবুলি

ঘুম আসছে না মধুবনের। রাত ১টা পেরিয়ে গেল। ওষুধ খেয়েছিল বাধ্য হয়ে। পাঁচদিন হল ঘুমহীন রাত চলছে। শরীর আর দিচ্ছে না। যে কোনও সময় বিগড়ে যাবে। পেডেস্টাল ফ্যানটা মাথার কাছে টেনে এনে শুয়েছিল। শরীরের ওপর দিয়ে হাওয়া বইছে। কিন্তু ঘুমের দেখা নেই। অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়েছিল। ঘুম আসার পরীক্ষিত পদ্ধতি হিসেবে নিশ্বাস গুনেছে, ভেড়া গুনেছে, নৌকায় ভেসেছে, কোথায় কী? চিৎ হয়ে শুলে ঘাড় থেকে পিঠ ভিজেছে ঘামে। বাঁ কাত হলে গলা আর বুক ভিজেছে। ডান কাত হলে কাঁধ পেট। ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ আর ৯০ শতাংশ আর্দ্রতা আর বৃষ্টিহীন এক মাসের দেওয়াল-ছাদ-মেঝের অগ্নিকুণ্ডে যারা ঘুমোতে পারে তারা মহামানব! মধুবন ছা-পোষা মানুষ, জাগতিক সমস্যায় পীড়িত হয়, কোনওভাবেই সে সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকতে পারে না।

আজকের রাতটাও ঘুম ছাড়াই যাবে ধরে নিয়ে কিছু একটা করার কথা ভাবে। পড়া যেতে পারে। হায়দার আকবর খান রনোর 'শতাব্দী পেরিয়ে' রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। সাদ্দামের দেশে কেমন ভোটাভুটি হতো, কীভাবে বাথ পার্টির পক্ষে ৯৮ শতাংশ ভোট আদায় করা হতো, তার ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্ট আছে। রনো পোলিটিকাল মানুষ হলেও নিজের চোখে দেখতে পারেন। আমেরিকা আক্রমণ করেছে বলেই সাদ্দামের সমর্থনে দাঁড়াতে হবে এমন গড্ডলে ভাসার মানুষ নন। এছাড়া, বাংলাদেশের রাজনীতির ভেতরের ছবিটা দারুণভাবে আছে। ভাষাটাও ঝরঝরে। বইটা ব্যাগে। ব্যাগটা বাইরের ঘরের টেবিলে। এ ঘরে নিয়ে এলেই হয়। চেয়ার টেনে ডিভানে পা তুলে বসা যায়। পেডেস্টালের মুখটা ঘুরিয়ে নেবে। শ্যামলেন্দুদা বলতেন, সময় পেলেই বই পড়বি। দেখবি, সময়টা কাটানো গেল, সময় তোকে কিছু দিল। খামোকা নষ্ট করবি কেন, কিছু জমিয়ে নে। একদিন ওই জমানোটা কাজে দেবে।

শ্যামলেন্দুদার কথা খুব মনে পড়ে মধুবনের। চওড়া কাঠামোর লম্বা মানুষটি চলন্ত বাস থেকে পড়ে কোমরে এমন চোট পেলেন যে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না। চাকরিটা ছেড়ে দিতে হল। পঙ্গু মানুষকে বেসরকারি ফার্ম পোষে না। কোম্পানির অবস্থা আগের মতো নেই বলে হাজার বিশেক টাকা, সমবেদনা, শুভেচ্ছা ও মানপত্র দিয়ে সম্পর্ক ছেঁটে ফেলল। কোম্পানির পলিসি-মেকার ছিলেন না শ্যামলেন্দুদা, কিন্তু অবস্থা খারাপের দায় তাকেই বইতে হলো। শ্যামলেন্দুদার জন্য আরামকেদারা বানিয়ে দেন তপতী বউদি। সারাদিনই সেইটাতে বসে থাকতেন। সকালে আর সন্ধ্যায় দু-চারজন ছাত্র পড়াতেন। বাকিটা সময় নিজের পড়া আর পড়া আর কখনও সখনও লেখা আর আরামকেদারাতেই বিশ্রাম। কী লিখতেন শ্যামলেন্দুদা? জানতে চেয়েছিল মধুবন, আপনি কবিতা লেখেন? হেসে বলেন শ্যামলেন্দুদা, এমন কেন মনে হল তোর? ডায়েরিতে লিখি বলে? অল্প লিখি বলে? গদ্য লিখতে হলে প্রচুর লিখতে হয়, তাই? অতশত ভাবেনি মধুবন, ভাবার বয়সও নয় তখন। শ্যামলেন্দুদাকে সে

লিখতে দেখেছে আনমনা হয়ে। তাই মনে হয়েছে কবিতাই লেখেন। শ্যামলেন্দুদা বলেছিলেন, লিখি না রে। নোট রাখি। কত রকমের অপরাধ আছে, কত অপরাধী। এইসব অপরাধের পেছনে যে মন থাকে, যে সামাজিক কারণ থাকে, সেইসব নোট করার চেষ্টা করছি। লেখা হবে কিনা জানি না। কী আর করব! অথর্ব হয়ে ঘরে পড়ে আছি।

মধুবন লিখতে জানে না। যদি জানত, শ্যামলেন্দুদা আর তপতী বউদিকে নিয়ে গল্প লিখত। স্বামী বা স্ত্রীর অসুস্থতা দাম্পত্যে ফাটল ধরিয়েছে, এ-বিষয়ে প্রচুর কাহিনী পড়েছে ও সিনেমা দেখেছে মধুবন। বাইরে স্বামীর গতিবিধিকে সন্দেহ করে অসুস্থ স্ত্রী। কিংবা স্ত্রীর গতিবিধিকে সন্দেহ করে পঙ্গু স্বামী। সন্দেহ থেকে জন্ম নেয় অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা। যে অসুস্থ, অসহায়তা থেকে সে চরম আঘাত হানতে চায়। যে সুস্থ, যা করেই হোক সে মুক্তি চায়। জমজমাট কাহিনী সে-সব, যার মূলে আছে শরীর। কাহিনীগুলি নিছক বানানো নয় হয়ত, তবে শরীরের সার্বভৌমত্বের মাদকতা বেশি বলেই বার বার ফেনিয়ে তোলা হয়। মধুবন যদি লিখতে পারত, দেখিয়ে দিত পঙ্গু শ্যামলেন্দুদাকে নিয়ে কী অসাধারণ পূর্ণাঙ্গ দাম্পত্য তপতী বউদির। সভ্যতার নতুন নতুন মাত্রা হেলায় সরিয়ে রেখে অসভ্য থেকে গিয়েছিলেন দুজনে। প্রেমে এমন প্রাকৃতিক পূর্ণতা পেতে আর কাউকে দেখেনি মধুবন। বন্ধুদের কেউ কেউ মন্তব্য করত, একসেপশনাল। মধুবন জবাব দিত, আমরা তো একসেপশনালদের পুজো-আচ্চা করতেই শিখেছি! অনেক পরে, শ্যামলেন্দুদা তখন রোগে ভুগে ভুগে হাড্ডিসার, মধুবন জানতে চাওয়ায় তপতী বউদি বলেছিলেন, না না, সেবা-টেবা করতে হবে বলে থেকে যাওয়া নয়। কাকে সেবা করব? নিজেকে? যাব কোথায়? নিজের কাছ থেকে কেউ কি যেতে পারে? সহানুভূতি? কীসের সহানুভূতি? নিজেকে আমি সহানুভূতি দেখাই কী করে? ও কি আমার থেকে আলাদা? অবশ্য ওর অ্যাকসিডেন্টের পরপরই সহানুভূতির ধুম লেগেছিল। চোটটা যে বড়সড়, কিছু লোক কীভাবে যেন আগেই বুঝে যায়! এমন নাছোড়বান্দা সহানুভূতি যে অপমানও গায়ে মাখে না। আমিই কী ছাই আগে জানতাম এত লোক আমাকে চায়! কী বিচিত্র সব প্রস্তাব! কী গভীর বোধ! শ্যামলেন্দুকে ছেড়ে আসা মানবিক হবে না, কিন্তু জীবনের দাবি কেন অস্বীকার করবেন? অর্থাৎ পার্ট টাইম আসার ডাক। সমব্যথীদের ভিড় লেগে যেত বাড়িতে। কী মজা, শোনো, একজনকে বললাম, কাল আপনার বউয়ের কাছে যাব, তাঁকে বলব, স্বামীকে ভালোবাসেন না কেন? ভালোবাসা ছাড়া আপনার স্বামী বাঁচে কীভাবে? সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ধাঁ। শুনেছি আমার চরিত্র নিয়ে তিনি অনেকের কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন! আরেকজনকে বলেছিলাম, কাল যদি আপনার অ্যাকসিডেন্ট হয়, পরশু আমি অন্যের কাছে যাব, আপনার খারাপ লাগবে না তো? দেখুন, আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে, আমার সঙ্গী পুরুষরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হবেন। শ্যামলেন্দুর আগে আমার যে প্রেমিক ছিল সে রেলগাড়িতে কাটা পড়ে। মধুবনের মনে আছে, হাসতে হাসতে তপতী বউদি শ্যামলেন্দুদার বুকে লুটিয়ে পড়েছিলেন। সামলে বললেন, না, নীতিবোধ-টিতিবোধ আমার নেই। তাহলে স্কুলে র‍্যান্ডম ফাঁকি দিতে পারতাম না, পার্টির মিটিংয়ে স্কুলের বাচ্চাদের পাঠানোর বিরোধিতা করতাম, হেডমিস্ট্রেসের টাকা খেয়ে বই পাঠ্য করার দুর্নীতির প্রতিবাদ করতাম। আসলে, ব্যাপারটা এরকম জানো, ডান হাতে চোট লাগলে বাঁ হাত বেশি

কাজ করে, ডান পায়ে চোট লাগলে বাঁ পা বেশি ভার নেয়। এটাই স্বাভাবিক। এরপর যে যা খুশি ব্যাখ্যা করতে পারে। আমাকে সতী-সাবিত্রী ভাবতে পারে, আবার ফ্রিজিডও ভাবতে পারে।

মধুবনের কষ্ট হয়, সে লিখতে পারে না। শ্যামলেন্দুদা-তপতী বউদির কাহিনী কত মানুষকে জানানো যেত। শ্যামলেন্দুদা মারা গেছেন। তপতী বউদি এখানে আর থাকেন না। অপরাধের মনস্তত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের নোটগুলি নিশ্চয় নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন তপতী বউদি।

বালিশটা ভিজে গেছে। ঘুরিয়ে নেয়। এদিকটাও ভেজা। ঢাকনাটা কতকাল আগে যেন ধোয়া হয়েছিল। এমনিতেই ন্যাতা হয়ে গেছে, তার ওপর নুন জমেছে। আরেকটা বালিশ অবশ্য আছে। সেটা বের করতে হলে ডিভান খুলতে হয়। কোন ভেতরে আছে কে জানে। কাল ঝুমা এলে প্রথমেই বলবে পুরনো বালিশটা বের করে দিতে। ঝুমা বলতে পারে, এটা কি আর বালিশ, ইট মতো হয়ে গেছে। তার চেয়ে পিঁড়ে মাথায় দিয়ে শোয়া আরামের। ঝুমা কথা বলে বেশি, এবং প্রায় সব কথাতেই 'মতো' থাকে। যেমন বলতে পারে, একখান তুলোর মতো বালিশ করান দেখি। শুলেই সিনেমা আর্টিস্টদের মতো মাথা ডুবে যাবে আর স্বপ্নে সিনসিনারি ভাসবে। সিরিয়ালের মতো বিছানা করান না একখান। ঝুমাকে ভালোই লাগে মধুবনের। ওর কথায় মজা পায় বলে প্রশ্রয়ও দেয়। ওর মা অষ্টমী আগে এ বাড়িতে কাজ করত। পরে পাড়ারই এক বৃদ্ধার দেখভালের কাজ পাওয়ায় ঝুমাকে এখানে দিয়ে যায়। তোমার বাড়িতে কাজ আর কী! মেয়ে চালিয়ে নেবে। তুমার বুনের মতো দেখো ঠিক পারবে। অষ্টমীর শেষ বাক্যের ইঙ্গিতে রাগ হয়েছিল মধুবনের। কিন্তু কী করবে, লোক খুঁজতে বেরবে কোথায়, সেখানে যে ইঙ্গিত থাকবে না কে বলল, আরও বিশ্রী ব্যাপার থাকতে পারে, আর অষ্টমী অবান্তর কিছু বলেনি, সমাজ তো এখন এরকমই, নাতনিও রেহাই পাচ্ছে না দাদুর লালসা থেকে।

পুরনো বালিশের ওয়াড়টা যদি ভালো থাকে সেটা এই বালিশে পরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে তো কাল হবে, আজ যে আর মাথায় রাখা যাচ্ছে না। নিজের ওপর রাগ হয় মধুবনের। সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সে ভাবতে পারে না, তার জন্য একটু উদ্যোগী হতে পারে না। ইউনুসকে বললেই এক নম্বর শিমুলের বালিশ বাড়িতে দিয়ে যাবে। স্বাচ্ছন্দ্য মানে তো বিলাসিতা নয়, সুস্থ থাকারই অঙ্গ। বিলাসিতা হলেই বা ক্ষতি কি? সে তো প্রজা মেরে রাজকীয় সম্ভোগ করছে না, বা ত্রাণের টাকা মেরে প্রাসাদ বানাচ্ছে না, বা ঘুষ বা কমিশনের পয়সায় মডেলদের কোলে বসাচ্ছে না। একটু ভালো প্যান্ট-শার্ট পরা, দু'বেলা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া, ভালো গান শোনা, ভালো ছবি দেখা, ভালো বই পড়া, স্বস্তিতে ঘুমোনো এবং বছরে একবার কোথাও বেড়াতে যাওয়া, মাঝে মাঝে একটু পান করা, এই তো। এর মধ্যে বিলাসিতা কোথায়? আরও স্বাচ্ছন্দ্য যদি চায় তাতে আপত্তি কী? বৈধ উপার্জনের মধ্যেই সেটা হতে পারে। ঘরটা এ সি হলে সে ঘুমোতে পারত। আগামীকালের জন্যে তাজা থাকত।

চিত্রভানু ঠিকই বলে হয়তো, এ সি লাগাও। নিজে একটু আরাম করো, আমাদেরও দাও। মাঝে মাঝে তোমার ঘরে আড্ডা বসানো যায়। চিত্রভানুদের আড্ডা মানে সাংঘাতিক। বিলীয়মান থার্ড স্ট্রিমের খরসৌন্দর্য। একেকজন যেন বুলডোজার। যেমন অমিত: পারবেন আপনি,

জীবনানন্দের আদ্যন্ত প্রতিষ্ঠানবিরোধী জীবনযাপন নিয়ে মুগ্ধতাসূচক বই লিখে প্রতিষ্ঠানের পুরস্কারের জন্য ঠিকঠাক লোকের দরজায় বডি ফেলতে? পারবেন আজ যাকে বলছেন রাবিশ, কাল তাকে অ্যাসেট বলতে? পারবেন না, আপনার কিস্‌সু হবে না। যেমন জয়ন্তু: রুগ্‌ণ বাচ্চাকে দেখিয়ে কোনও মা ভিক্ষে করলে আমরা বাজে মন্তব্য করি। দেশের মানুষকে রুগ্‌ণ দেখিয়ে যখন রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্ব-ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাতে, তার বেলা? তখন তো বলি না তোমার অপদার্থতার জন্য আমরা রুগ্‌ণ! শিল্প নয়ছয় করে দিয়ে শিল্পের জন্য বিদেশি পুঁজির কাছে হাত পাতে যারা, তাদের দিকে দু-চারটে অসাংবিধানিক সম্ভাষণ কেন ছুঁড়ে দিই না? রুগ্‌ণ সরকারি সংস্থার মোটা স্যালারি উইথ ফ্রি পার্কসওয়ালা চেয়ারম্যানদের পেছনে কেন জলবিছুটি ঘষে দিই না? যেমন ঋতব্রত: সুরেনটা এবার বুদ্ধিজীবী হয়ে গেল! মিডিয়ার চাকরি পেয়েছে। না পড়ে, না বুঝে বিজ্ঞের মতো মত দেবে। সব ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞ। কেউ পেছনে লাগতে যাবে না। দাদার হাতে মিডিয়া আছে ছুঁড়ে মারবে, দাদা বুদ্ধিজীবী যে! কিংবা উদ্দালক: লিখতে আমাকে হবেই। লোকে পড়ে না তো কী করা যাবে! ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা আমরা দেখিনি। ঋত্বিক দুঃখ করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন। ছবি করা বন্ধ করে দেননি। সত্যজিৎ রায়ের ছবি আমরা দেখিনি। দল বেঁধে 'বেদের মেয়ে জ্যোস্‌না' দেখতে গিয়েছি। ওটাই আমাদের স্ট্যান্ডার্ড। তাই বলে সত্যজিৎ রায় ছবি বন্ধ করে দেননি বা 'বাগদি মেয়ে ঝলকানা' বানাতে যাননি। আমরা যাঁদের কাজকর্মের জন্য গর্বটর্ব করি, যাঁদের জন্মদিনটিন করে গাবাই, জীবদ্দশায় তাঁদের আমরা ভুট্টা করেছি। কী করা যাবে? এটাই আমাদের অহংকার! শম্ভু মিত্রকে উদ্ধৃত করে বলতে পারি, নিখাগি মায়ের নিখাগি সন্তান হয়ে নিজের লেখাটা লিখেই যাব।

মধুবন একবার ভেবেছিল, শ্যামলেন্দুদা-তপতী বউদির কাহিনী উদ্দালককে বলে। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার চালু রীতির ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ওঁরা অন্যান্য সামাজিক সর্ম্পকের ফস্কা গেরোগুলি চিনিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং, প্লটটা হয়ত উদ্দালকের মনোমত হবে। কিন্তু বলেনি মধুবন, উদ্দালক যদি আগ্রহ না দেখায়। তাছাড়া, উদ্দালকের লেখা, মধুবন যেটুকু পড়েছে, কোনও কাহিনীর ওপর দাঁড়ায় না, ও যেন কাহিনী চিরে চিরে কিংবা একাধিক কাহিনীর অন্তর্বয়নে একটা ভাষ্য রচনা করতে চায়।

নাঃ, আর বিছানায় থাকা যাচ্ছে না। চাদর ভিজে গেছে। মশারির ভেতর যেন একটা ভাপ জমা হয়ে আছে। পেডেস্টাল ফ্যানটাও গরম হাওয়া ঠেলছে। কোথাও ঠাণ্ডা হাওয়া না থাকলে ও কোথায় পাবে? ওসব বিজ্ঞাপনে হয়। যুবতীর আধা-উদোম বুকে তুষার জমে। পোলিটিকাল পার্টিগুলিও এখন অ্যাড ফার্মের শরণ নিচ্ছে। মানুষ আর বিশ্বাস করছে না। আমাদের ভাষা ধরা পড়ে গেছে। নতুন ভাষা চাই, নতুন ইমেজ চাই। যা লাগে দেব। নতুন স্লোগান বের করুন, মশাই। খাবে এবং মাথায় মাখবে। ভাববেন না, অন্যভাবে আরও পাইয়ে দেব।

মশারির ভেতর থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে আসে মধুবন। অসহ্য! ২টো ১০। মশারি খুলে পাখার মুখোমুখি বসে। মাথা নুইয়ে দেয়, যেন গরমের তীব্রতম কণাগুলি খোপরিতে জমেছে। এভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে এটুকু বুঝতে পারল যে কপাল, গলা, বুক, কাঁধের ঘামটা শুকিয়েছে, যেটা মশারির ভেতর কিছুতেই হচ্ছিল না। ঝুমা বলেছে, মশারির

ভেতর কী করে শোন আপনি? আমরা কবেই তুলে দিয়েছি। ভেতরটা পেসার কুকারের মতো লাগত। মধুবন বলেছিল, মশা কামড়ালে ঘুমোতে পারি না। ঝুমার পরামর্শ, কল জ্বালবেন। দু-চারটে তো খাবেই।

চৌমাথায় পুরসভার ম্যালেরিয়া দূরীকরণের হোর্ডিংয়ে লেখা আছে: 'মশা রাতে কামড়ায়। মশারী ছাড়া শোবেন না।' মশারির ওপর জোর দিতেই হয়তো ঈ-কার। মশা কি দিনে কামড়ায় না, নাকি দিনে কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয় না? যত্তো সব অপদার্থ, পুরনো জ্বর-জারি ফিরে আসছে আর হরেকবাবু বাগানবাড়ি খুলছে। মাথাটা সত্যি গরম হয়ে গেছে মধুবনের। ডক্টর চৌধুরী বলেছিল, ওষুধ খাওয়ার মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যে রাতের খাবারটা খেয়ে নেবেন। টিভি দেখবেন না, ধূমপান করবেন না। সামান্য হাঁটাহাঁটি করুন খালি পায়ে। একদম টেনশন নয়। রিল্যাক্স। প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস কেউই এড়াতে পারে না। বৃষ্টি না হলে চাষাভুসোও কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে। যার বিরুদ্ধে করাপশন চার্জ আছে, সে কি রাতে ঘুমোয় না? গোষ্ঠিবাজিতে যার অস্তিত্ব বিপন্ন, সে কি রাতে ঘুমোয় না? যে পুলিসটা লকআপে একটা লোককে পিটিয়ে মারল, সে কি রাত জেগে বসে থাকে? রিল্যাক্স, মধুবনবাবু, রিল্যাক্স। বয়সটা ভালো নয়। ৪৫ থেকে ৫০-এ একটা টেনডেনসি থাকে। সতর্ক থাকা ভালো। দরকার হলে কারও কাছে দীক্ষা নিতে পারেন। উত্তরভারত থেকে সাধু-সাধ্বীরা শহরে আসছে। বলবেন, যোগাযোগ করিয়ে দেব। ওদের কমিউনিটি শেলটার আছে। গুরুভাই হতে পারলে আর অসহায় বোধ করবেন না। ভিসি টু ওসি সব পকেটে।

মধুবন আলো জ্বালিয়ে বাথরুমে ঢোকে। স্নান করলে আরাম হতে পারে। জলটা হয়তো এখন কিছুটা জুড়িয়েছে। পায়জামার কোমরটা ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেছে। পাল্টানো দরকার। বেরিয়ে আসে। আলনা থেকে কাচা পায়জামা তুলে নেয়। গান শুনলে কেমন হয়? অনেকদিন শোনা হয় না। এই গরম সব উল্টে-পাল্টে দিয়েছে। সকালে গান শুনতে শুনতে স্নান করা মধুবনের অনেককালের অভ্যাস। শুধু অভ্যাস বলা ঠিক হবে না, এক ধরনের অনুশীলন, যা তাকে সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করে, অনেক বিরুদ্ধতার মধ্যেও অটুট থাকার শক্তি সে অর্জন করে। সেই অনুশীলনটাই ভেঙে দিল এবারের গরম। মধুবনের অদিতি মহসিন শুনতে ইচ্ছে করে। কী ভালো যে গান ভদ্রমহিলা! বিশেষ করে 'এখনই কি হল তোমার যাবার বেলা, হায় অতিথি' আর 'বন্ধু রহো রহো সাথে'। অনবদ্য, অসাধারণ! মাথার কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়বে, বুকের ভেতর বাজবে। গান শেষ হলে নিজেকে তুমি অন্যভাবে আবিষ্কারও করতে পারো। বলেছিল কৌশিক। জানো, পৃথিবীতে কিছু ভালো থাকে বলেই বেশিরভাগ মানুষ উন্মাদ হয় না। তারা ছবির কাছে দাঁড়ায়, গানের কাছে দাঁড়ায়, পুরাণের কাছে দাঁড়ায়। সমসময়ের পাপের ধাক্কা থেকে বাঁচতে পারে। নাহলে তো উন্মাদ হয়ে যাওয়ারই কথা। রামকিঙ্করের মূর্তি, রবীন্দ্রনাথের গান, জীবনানন্দের কবিতা না থাকলে আমার বাঁচাটা কীরকম হতো ভাবতেই পারি না। শাওয়ার থেকে জল পড়ে, জল ঝরে। মধ্যরাতে মৃদু স্বরে একান্ত কথোপকথনের মতো অদিতি মহসিন গাইতে থাকেন, জানালে না গানের ভাষায় এনেছিলে যে প্রত্যাশা।/শাখার আগায় বসল পাখি, ভুলে গেল বাঁধতে বাসা। মধুবন গলা মেলায়, দেখা হল, হয়নি চেনা/প্রশ্ন